এন্টিবায়োটিকযুক্ত খাদ্যকে 'না' বলুন

আ ব ম ফারুক
অধ্যাপক, ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগ
সাবেক ডীন, ফার্মেসি অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইলঃ abmfaroque@yahoo.com
ফোনঃ ০১৮৩ ০০০ ২৮২৬

খাবার আমাদের শরীরে পুষ্টি যোগায়, ক্ষয় পূরণ করে, কাজে ও লেখাপড়ায় শক্তি দেয় এবং নতুন টিস্যু তৈরি করে। বেঁচে থাকার জন্য খাবার অপরিহার্য। এন্টিবায়োটিক বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার, যা রোগজীবাণুকে মেরে ফেলে। তাই জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হলে আমরা সেই সেই জটিল অসুখ সারাতে ওষুধ হিসেবে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি। এই এন্টিবায়োটিক আবার যেমন খুশি ব্যবহার করা যাবে না। এর ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। নিয়ম ভেঙ্গে ব্যবহার করলে তা শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করে। এই ক্ষতির তালিকা দীর্ঘ। সবচেয়ে কম ক্ষতি এলার্জিক বিক্রিয়া থেকে শুরু হয়ে বেশি ক্ষতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসমূহ, যেমন কিডনি লিভার ইত্যাদি, বিকল হয়ে কালক্রমে মৃত্যুবরণ করা। এসব ক্ষতি দৃশ্যমান। কিন্তু নীরব অথচ মারাত্মক আরেকটি ক্ষতি হলো জীবাণুর 'এন্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্স' তৈরি হওয়া অর্থাৎ জীবাণুগুলোর এন্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী হয়ে যাওয়া। এর ফলে চিকিৎসক সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করে সঠিক এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করলে এবং রোগী সঠিক মানসম্পন্ন সেই এন্টিবায়োটিকটি সঠিকভাবে সেবন করলেও রোগের কারণ যে জীবাণুটি তা মরবে না, বরং তার নিয়মে বংশ বিস্তার করে যাবে। এর ফলস্বরূপ সংক্রমণটি ক্রমাগত বাড়তে থাকবে, অত্যন্ত নামীদামি হাসপাতালে গেলেও কোনো কাজ হবে না। রোগের এক পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে রক্তের মাধ্যমে জীবাণুটি শরীরের সর্বত্র সংক্রমণের বিস্তৃতি ঘটাবে, সেপটিসেমিয়া অর্থাৎ রক্তের মারাত্মক সংক্রমণ ঘটবে, একের পর এক অঙ্গ বিকল হতে থাকবে, মাল্টিঅর্গান ফেলিউর হয়ে একসময় রোগী মারা যাবে। এই এন্টিবায়োটিক-রেসিস্ট্যান্স একটি জীবাণুর কারণে না হয়ে একাধিক জীবাণুর কারণেও হতে পারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই ঘটে থাকে। আবার এই জীবাণুগুলোর রেসিস্ট্যান্সএকটিমাত্র এন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে না হয়ে একাধিক বা বহুবিধ এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে, তখন একে বলা হয় 'মাল্টি-ড্রাগ রেসিস্ট্যান্স', যা ভয়াবহ।

এন্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্স বিবিধ কারণে হতে পারে। প্রধান করণটি হলো জীবাণুকে মারার জন্য যে পরিমাণ এন্টিবায়োটিক প্রয়োজন তার চেয়ে কম পরিমাণে এন্টিবায়োটিক সেবন। তাছাড়া মানবদেহে ঘনঘন বা অধিক পরিমাণে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার, এন্টিবায়োটিক পুরো কোর্স সম্পন্ন না করা, কয়েকদিন ব্যবহারের পর একটু ভালো বোধ করলে আর সেবন না করা, নকল ভেজাল বা নিম্নমানের এন্টিবায়োটিক সেবন করা ইত্যাদিও অন্যতম কারণ। এসব কারণে যাতে এন্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্স তৈরি না হয় তার জন্য বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতেই চিকিৎসকগণ রোগীদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। উপরন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার সদস্য দেশসমূহের সরকারগুলোর মাধ্যমে এসব বিষয়ে রোগীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যও নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশেও এরকম কর্মসূচি রয়েছে। কিন্তু আমাদের একটি অন্যতম সমস্যা হলো এন্টিবায়োটিক উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও ওষুধ প্রশাসন কর্তৃক শতাধিক ওষুধ কোম্পানিকে এন্টিবায়োটিক উৎপাদনের লাইসেন্স দেওয়ার কারণে তারা যুগ যুগ ধরে যেসব নিম্নমানের এন্টিবায়োটিক উৎপাদন করছে তার ফলে আমাদের দেশে জীবাণুর এন্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্স মারাত্মক হারে বেড়ে এখন এটি একটি অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। সরকারের ঐকান্তিক আগ্রহ থাকার পরেও সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোর অদক্ষতা ও অনৈতিকতা জনস্বাস্থ্যের কী বিরাট ক্ষতি করতে পারে এটি তার একটি উদাহরণ।

কিন্তু এন্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্স তৈরির ক্ষেত্রে সম্প্রতি যে আরো একটি নতুন ও ভয়াবহ কারণ যোগ হয়েছে, তাহলো খাবারের মধ্যে এন্টিবায়োটিকের অনুপ্রবেশ। বাংলাদেশে এই অনুপ্রবেশ ঘটছে তিনভাবে। প্রথমত, আমাদের মাংস দুধ ও মাছের খামারিরা তাদের অসুস্থপশু ও মাছকে চিকিৎসা করার জন্য এন্টিবায়োটিকের অযাচিত ব্যবহার করছে। দ্বিতীয়ত, ফিড ম্যানুফ্যাকচারার অর্থাৎ পশুখাদ্য ও মাছের খাদ্যের উৎপাদকরা পশু ও মাছের রোগ প্রতিরোধের নামে তাদের ফিডে কোনো যুক্তি ছাড়াই এন্টিবায়োটিক মেশাচ্ছে।আর তৃতীয়ত, পরিবেশ দূষণের কারণে খাবার পানির মধ্যে অতি সামান্য পরিমাণে এন্টিবায়োটিক মিশে যাচ্ছে।

খামারগুলোতে গরু ছাগল মুরগি অসুস্থ হতেই পারে। এসব অসুস্থতার অনেকগুলোই জীবাণুর আক্রমণের কারণে ঘটতে পারে। সেগুলোর চিকিৎসার জন্য এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সেগুলো নিতে হবে প্রাণিচিকিৎসার জন্য সুনির্দিষ্ট করা এন্টিবায়োটিকগুলোর মধ্য থেকে, কোনো অবস্থাতেই মানবচিকিৎসায় ব্যবহৃত এন্টিবায়োটিক থেকে নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনো কোনো ওষুধ কোম্পানি ও প্রাণিচিকিৎসক মানুষের চিকিৎসায় নির্দেশিত এন্টিবায়োটিকের অনেকগুলোই যথাক্রমে অতি মুনাফার লোভে ও দ্রুত আরোগ্যের জন্য নিয়মবিরুদ্ধভাবে প্রাণিচিকিৎসায় ব্যবহার করছেন। এসব এন্টিবায়োটিক রোগ সারার বহু পরেও প্রাণির শরীরে কিছু পরিমাণে থেকে যায়। ফলে এসব পশুর মাংস বা দুধ কিংবা মাছ খেলে মানব শরীরে সামান্য পরিমাণে এন্টিবায়োটিক শরীরে প্রবেশ করে রেসিস্ট্যান্স সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে সেই মানুষটি কোনো জীবাণু সংক্রমণে অসুস্থ হওয়ার প্রেক্ষিতে সেই এন্টিবায়োটিক চিকিৎসক-নির্দেশিত মাত্রায় খেলেও কোনো কাজ হয় না।

এন্টিবায়োটিক কখনোই কোনো রোগ প্রতিরোধ করতে পারে না, রোগ হয়ে গেলে সেই জীবাণুকে মারতে পারে। অথচ আমাদের দেশে ও বিদেশে ক্যাটল ফিড, পোল্ট্রি ফিড ও ফিস ফিডের অনেককোম্পানি তাদের উৎপাদিত ফিডগুলোতে অনাবশ্যকভাবে প্রাণিদেহ ও মানবদেহে ব্যবহার্য উভয় ধরনের এন্টিবায়োটিক মেশাচ্ছে। তারা বলে এর ফলে নাকি গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি-মাছের অসুখ হওয়ার হার কমে যায় এবং এগুলোর স্বাস্থ্য ভালো হয়, অথচ এসব দাবির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বরং কোনো অসুখ ছাড়া সামান্য পরিমাণে এন্টিবায়োটিক প্রাণিখাবারে মিশিয়ে দেওয়ার ফলে এসব প্রাণির শরীরে এন্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্ট জীবাণু জন্মাচ্ছে। এগুলো খেয়ে কিংবা এসব প্রাণির সংস্পর্শ, রক্তও বিষ্ঠার মাধ্যমে এসব রেসিস্ট্যান্ট জীবাণু মাটি ও পানিকে দূষিত করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে –মানুষের শরীরেতো বটেই। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন যে, রেসিস্ট্যান্ট জীবাণুগুলোর জিন কোডিং এন্টিবায়োটিক-সংবেদনশীল জীবাণুগুলোর শরীরে প্রবেশ করে সেগুলোকেও রেসিস্ট্যান্ট করে দিচ্ছে।এভাবে কোম্পানিগুলোনিজেরা মোটা অঙ্কের মুনাফা করছে ঠিকই, কিন্তু মানুষের দেহে বিপজ্জনক এন্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্স সৃষ্টি করে জনস্বাস্থ্যের বিপুল ক্ষতি করছে।

মাংস, দুধ ও মাছের উৎপাদন বাড়ানোর নামে সারা পৃথিবীতেই এন্টিবায়োটিক রেসিস্ট্যান্স বেড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত কারণ দু'টি আজ বড় হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে।

খাবার পানির উৎসগুলোতে এন্টিবায়োটিক মিশে যাচ্ছে যেসব কারণে তার মধ্যে রয়েছে, (এক)এন্টিবায়োটিক ব্যবহারকারী মানুষের বর্জ্য পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাসায়নিক দিয়ে পরিশোধন না করে নদীতে বা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা, (দুই) রোগীদের অব্যবহৃত কিংবা মেয়াদোত্তীর্ণ এন্টিবায়োটিক ড্রেনে বা আবর্জনার বিনে ফেলে দেওয়া এবং (তিন) যেসব ওষুধ কোম্পানির উপযুক্ত বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট - ইটিপি) নেই তাদেরকেও ওষুধ প্রশাসন কর্তৃক এন্টিবায়োটিক উৎপাদনের অনুমতি দেওয়ার ফলে তাদের কারখানার বর্জ্যগুলো খালে-বিলে-নদীতে কিংবা পৌর কর্পোরেশনের ড্রেনে সরাসরি ফেলে দেওয়া। এভাবে পরিবেশে নিঃসৃত এন্টিবায়োটিক ভূ-উপরিস্থ খাবার পানির উৎসেমিশে যাচ্ছে, এমনকি ধীরে ধীরে ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলোকেও স্পর্শ করছে। অতি সামান্য পরিমাণে হলেও এসব এন্টিবায়োটিক তাই খাবার পানির মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে।

প্রাণিসম্পদে ব্যবহারের কারণে আমাদের খাবারেমিশে যাওয়া এন্টিবায়োটিকের পাশাপাশি খাবার পানিতে অতি সামান্য এন্টিবায়োটিকের উপস্থিতি এখন একটি বৈশ্বিক সমস্যায় রূপ নিয়েছে, যদিও দেশে কিংবা বিদেশে এবিষয়ে গবেষণা ও আলোচনা অত্যন্ত কম। মানবচিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট এন্টিবায়োটিকগুলো প্রাণিসম্পদে ব্যবহৃত হওয়ার সমস্যাটিই আজ বিশ্বব্যাপী বড় সংকট সৃষ্টি করেছে এবং বিজ্ঞানীরা এথেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজছেন। এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সের এই সংকট এখনই থামানো বা নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে পৃথিবীময় সমগ্র মানব-সভ্যতা অদূর ভবিষ্যতে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়বেএবং কোনো জটিল সংক্রমণ নয় বরং অতি সাধারণ সংক্রমণেই মানুষ মারা যেতে থাকবে, কারণ কোনো এন্টিবায়োটিকই তখন আর কার্যকর থাকবে না। আমাদের বেঁচে থাকার স্বার্থেই তাই আমাদের এন্টিবায়োটিকগুলোকে বাঁচানো প্রয়োজন।

আজকের পৃথিবীতে যত এন্টিবায়োটিক আছে তার প্রায় অর্ধেকই প্রাণিসম্পদের চিকিৎসা ও 'মোটাতাজাকরণে' ব্যবহার করা হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষার জরুরি প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে পৃথিবীর ৫১টি দেশ প্রাণি মোটাতাজাকরণে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও এখনো অনেক দেশ এমনকি সবচেয়ে অগ্রসর বলে দাবীদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদকদের পুঁজির দাপটে এখনো তা নিষিদ্ধ করা হয়নি, যদিও রাষ্ট্রটি স্বীকার করেছে যে অধিক হারেএন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সের কারণে তাদেরকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রতি বছর অতিরিক্ত ২০ বিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়।

এই বৈশ্বিক সংকটের প্রেক্ষিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১১ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য হিসেবে এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সের বিরুদ্ধে সচেতনতাকে বেছে নেয় এবং প্রাণিদেহে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার কমানোর আহ্বান জানায়। পরের বছরও এই সংস্থা এ বিষয়ে বিশদ রিপোর্ট প্রকাশ করে। এসব কর্মকাণ্ডের কারণ হলো এই সত্য যে, এন্টিবায়োটিকগুলো প্রকৃতিতে অতি ধীরে নষ্ট হয়। সালফোনেমাইড, ক্লোইনোলন, টেট্রাসাইক্লিন ও কিছু ম্যাক্রোলাইড এজন্য সুবিদিত। অন্যান্য অনেকগুলো এন্টিবায়োটিকের অবস্থাও তথৈবচ। তবে এমাইনোগ্লাইকোসাইড এবং বিটা-ল্যাকটামগুলো সহজেই নষ্ট হয়। অর্থাৎ অধিকাংশ এন্টিবায়োটিকই প্রকৃতিতে সহজে বিনষ্ট হয় না বলে এগুলো থেকে এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স সৃষ্টির আশংকা অনেক বেশি। তাই এন্টিবায়োটিক অত্যন্ত হিসেব করেই ব্যবহার করা উচিত।

অথচ তা হচ্ছে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক জরিপে দেখা যায়, ২০১৫ সালে সারা পৃথিবীতে ৬৩,২০০ টন এন্টিবায়োটিক প্রাণিদেহে ব্যবহৃত হয়েছে। এই হারে চললে ২০৩০ সালে যা ১,০৫,৬০০ টনে গিয়ে দাঁড়াবে। আর এর ফলে যে অবস্থারসৃষ্টি হচ্ছে তা যে কত ভয়াবহ তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক পরিসংখ্যানই বলে দেয়। সেখানে প্রতি বছর প্রায় ২০ লক্ষ লোক এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স সমস্যায় আক্রান্ত হয় এবং এদের মধ্যে প্রায় ২৩ হাজার লোক রেজিস্ট্যান্ট জীবাণুর সংক্রমণে মারা যায়। রেজিস্টেন্সের কারণে এন্টিবায়োটিকগুলো ক্রমাগত তাদের কার্যকারিতা হারাচ্ছে বলেই এমনটি ঘটছে।

বাজারে প্রচলিত এন্টিবায়োটিকগুলোর কার্যকারিতা হারানোর পাশাপাশি কিছুটা আশার বাণী থাকতে পারতো যদি বিজ্ঞান নতুন নতুন এন্টিবায়োটিক আবিষ্কার করতো। কিন্তু তাও হচ্ছে না। ওষুধের গবেষণা ও নতুন ওষুধ আবিষ্কার নিয়তই চলছে। কিন্তু সেগুলো বড়লোক দেশগুলোর অসুখ ও বিশ্ব বাজারকে বিবেচনায় নিয়ে। এই বিবেচনায় এন্টিবায়োটিক এখনো বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলোর অগ্রাধিকারের তালিকায় নেই। তালিকায় বরং আছে যৌন সমস্যা, টাক পড়া, স্থুলতা, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদির ওষুধ। চলমান এন্টিবায়োটিকগুলো একে একে কার্যকারিতা হারালে এবং নতুন এন্টিবায়োটিক আবিষ্কার না হলে পৃথিবীর মানুষ দাঁড়াবে কোথায়?

মানব সভ্যতার এই ভীষণ বিপদকে মাথায় নিয়ে সারা বিশ্বে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ এবছরের বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবসে প্রতিপাদ্য হিসেবে "এন্টিবায়োটিকযুক্ত খাবারকে 'না' বলুন" শ্লোগানকে গ্রহণ করেছে। এছাড়া এবছরের সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স নিয়ন্ত্রণের বাস্তব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে উচ্চ

পর্যায়ের নীতিনির্ধারণী বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে মানবদেহে এন্টিবায়োটিকের অধিক ব্যবহার বন্ধ করা এবং নতুন এন্টিবায়োটিকের আবিষ্কারে সচেষ্ট হওয়ার পাশাপাশি পশুপালন ও মাছ চাষে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার এজেন্ডাও রয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতিসংঘ চাইছে এই গুরুতর সংকটের মোকাবেলায় সদস্য দেশসমূহের সরকারগুলো বলিষ্ঠ ও বাস্তবনিষ্ঠ কর্মপন্থা গ্রহণ করুক। বিশেষ করে পশু, হাঁস-মুরগি ও মাছ চাষের সময়ে 'রোগ প্রতিরোধমূলক' ও 'মোটাতাজার' কাজে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ হোক। যদি পশু, হাঁস-মুরগি ও মাছ রোগাক্রান্ত হয় তাহলে তাদেরকে প্রাণিদেহের জন্য নির্দিষ্ট এন্টিবায়োটিকগুলো দিয়েই চিকিৎসা করা হোক, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই মানবদেহে ব্যবহার্য এন্টিবায়োটিক দিয়ে নয়। জাতিসংঘ আরো প্রত্যাশা করছে যে, এই কাজে শুধু সরকার নয়বরং বেসরকারি উদ্যোগও সক্রিয় হোক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবক, এনজিও, খাদ্য উৎপাদক, খাদ্য ব্যবসায়ী হোটেল-রেস্টুরেন্ট এবং ভোক্তারাও সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হোক। মানব-সভ্যতাবিনাশী মানবসৃষ্ট এই মহাসংকটে সবাই যার যার অবস্থান থেকে জোরালো ভূমিকা পালন করুক।

সারা বিশ্বে ভোক্তা অধিকার নিয়ে কাজ করা 'কনজিউমার্স ইন্টারন্যাশনাল' এই সংকটে গত কয়েক বছর ধরেই ভূমিকা রাখা শুরু করেছে। তারা প্রথম ধাপ হিসেবে বিশ্বজুড়ে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা করা সর্ববৃহৎ তিনটি প্রতিষ্ঠান ম্যাকডোনাল্ড, সাবওয়ে এবং কেএফসি-কে আহ্বান জানিয়েছে ঘোষণা করতে যে তারা এমন কোনো গরু, শূকর বা মুরগির মাংস ব্যবহার করবে না যাতে মানব-চিকিৎসায় ব্যবহৃত কোনো এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়েছে। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান যদি এই নিশ্চয়তা দেয় তাহলে অন্য খাদ্য ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও তা বিরাট প্রভাব ফেলবে। কারণ সারা পৃথিবীতে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের শাখা আছে এক লক্ষেরও বেশি। এই আহ্বানের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে তাদের কাছ থেকে অল্প হলেও কিছু সারা মিলেছে।

গত বছর বিভিন্ন দেশের আরো ১৯টি ভোক্তা সংগঠন উপর্যুক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানের জাতীয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে একই অনুরোধ পাঠায়।

গত বছরের মার্চে ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করেছে যে, আগামী দুই বছরের মধ্যে তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেস্টুরেন্টগুলোতে তারা এন্টিবায়োটিক খাওয়ানো হয়েছে এমন মুরগির মাংসের ব্যবহার বন্ধ করবে। তারপর অক্টোবরে (২০১৫) তারা কানাডার জন্যও এমন ঘোষণা দিয়েছে। অন্যান্য দেশের শাখাগুলোর ব্যাপারে তারা এখনো কিছু বলেনি, যেমন দেয়নি মুরগি ছাড়া অন্যান্য মাংসের বেলাতেও এমন কোনো নিশ্চয়তা। সারা পৃথিবীর ১০০টি দেশে তাদের দোকান রয়েছে ৩৬,০০০টি।

একইভাবে সাবওয়ে অক্টোবর ২০১৫-তে জানিয়েছে যে তারা ২০১৬ অর্থাৎ এ বছরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত তাদের সব দোকানে কখনো এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়নি এমন মুরগির মাংস ব্যবহার করবে। এ বছর তারা এরকম টার্কির মাংসও চালু করবে। তবে এরকম শূকর ও গরুর মাংস চালু করতে সময় লাগবে ২০২৫ সাল পর্যন্ত। সারা পৃথিবীর ১১১টি দেশে তাদের দোকান রয়েছে ৪৪,৫৮৯টি।

তবে কেএফসি এখনো এ বিষয়ে কিছু জানায়নি। সারা পৃথিবীর ১১৫টি দেশে তাদের দোকান রয়েছে ১৯,৪২০টি।

উপর্যুক্ত তিনটি ছাড়াও কনজিউমার্স ইন্টারন্যাশনাল আরো যেসব খাদ্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছে অনুরোধ পাঠিয়েছিল সেগুলো হলো বার্গার কিং (সুইডেন ও জার্মানি), হেসবার্গার (ফিনল্যান্ড), ম্যাক্স (সুইডেন), নন্দস্ (দক্ষিণ আফ্রিকা), পিৎজা হাট (জার্মানি), কুইক (বেলজিয়াম) এবং ভাপিয়ানো (জার্মানি)। তারা উত্তরে জানিয়েছে যে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে, তবে সুনির্দিষ্ট কিছু এখনো বলেনি।

এই বড় আন্তর্জাতিক চেইন রেস্টুরেন্টগুলোর কাছে অনুরোধ পাঠানোর কারণ হলো তাদের রয়েছে বিশাল ক্রয়শক্তি যা দিয়ে ব্যবসা ও মুনাফার পাশাপাশি তারা মানুষের কল্যাণে একটি ব্যাপক প্রভাব রাখতে পারে, তাদের দেখে অন্য ব্যবসায়ীরাও এগিয়ে আসতে পারে এবং তারা তাদের গৃহীত এই ভালো কাজটির বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের ভোক্তাদের মধ্যেও সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া তাদেরতো সামাজিক দায়বদ্ধতার কারণেও এটি করা উচিত, কারণ বিশ্বব্যাপী তাদের লক্ষ লক্ষ দোকানে রেজিস্ট্যান্ট জীবাণুযুক্ত মাংস ব্যবহার করে প্রতিদিন তারা কোটি কোটি মানুষের কম ক্ষতিতো করছে না।

২০১৪ সালে কনজিউমার্স ইন্টারন্যাশনাল এক হিসেবে জানিয়েছে যে, জীবাণুর এন্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সের কারণে এখন যে হারে মানুষ মারা যাচ্ছে তা কমানো বা বন্ধ করা না গেলে ২০৫০ সালে এশিয়া মহাদেশে ৪৭ লক্ষ ৩০ হাজার, আফ্রিকাতে ৪১ লক্ষ ৫০ হাজার, দক্ষিণ আমেরিকাতে ৩ লক্ষ ৯২ হাজার, ইউরোপে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার, উত্তর আমেরিকাতে ৩ লক্ষ ১৭ হাজার এবং ওসেনিয়াতে ২২ হাজার মানুষের এই কারণে মৃত্যুর আশংকা রয়েছে। এদের মধ্যে আবার অধিকাংশই হলো শিশু, গর্ভবতী মহিলা, বৃদ্ধ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত রোগীরা।

বৈশ্বিক মেগা পুঁজি শিশুদেরও নিষ্কৃতি দেয়নি। গত ২২ মে ২০১২ তারিখে যুক্তরাজ্যের ডেইলি মেইল পত্রিকায় প্রখ্যাত সাংবাদিক রব ওয়াহ জানিয়েছেন, শিশুদের বেবী ফুডেও প্রাণিদেহে ব্যবহার করা এন্টিবায়োটিক পাওয়া গেছে। কোম্পানিগুলোর মতে পরিমাণটি সামান্য হলেও বিজ্ঞানীরা সরকারের কাছে এগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর আইন প্রণয়নের দাবী জানিয়েছেন।

এই বৈশ্বিক সংকটে আসুন বাংলাদেশে আমরা সচেতন হই, এই নৈরাজ্যের পরিবর্তনে সোচ্চার হই এবং সবকিছু সরকারের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যার যার অবস্থান থেকে এ বিষয়ে ভূমিকা রাখি। বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মদের স্বার্থে আসুন দাবী করি সরকার যেন এ বিষয়ে কঠোর আইন প্রণয়ন করেন, আইন কার্যকর করেন এবং আইন ভঙ্গকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন। আসুন আমরা মানব ও প্রাণিদেহে এন্টিবায়োটিকের অপব্যবহার ও অধিক ব্যবহার বন্ধ করি, এন্টিবায়োটিকের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করি, মানবদেহে ব্যবহার্য কোনো একটি এন্টিবায়োটিকও প্রাণিদেহে ব্যবহার না করি, কোনো অবস্থাতেই 'রোগ প্রতিরোধের জন্য' প্রাণিদেহে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার না করি, এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সময় পুরো কোর্স সম্পন্ন করি এবং যেসব ওষুধ কোম্পানি এন্টিবায়োটিক উৎপাদনের সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও লাইসেন্স পেয়েছে তাদের এন্টিবায়োটিক উৎপাদনের লাইসেন্স বাতিল করি।

আমরা চাইলে কিন্তু পারি। বর্তমান সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণকে যে সাফল্য উপহার দিতে পেরেছেন তার কিছু কিছু আমরা জানি। কিন্তু অনেক তথ্যই আমরা পাই না বা লক্ষ্য করি না। এমনি একটি ছোট্ট কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের আজকের আলোচনার জন্য সম্পর্কিত একটি তথ্য চোখে পড়েছিল ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ দৈনিক ভোরের কাগজের অনেক ভেতরের পাতায়। সেখানে জানা যায় যে, গাজীপুরের শ্রীপুরস্থ মুরগির মাংস উৎপাদনকারী খামারিরা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার বন্ধ করে নিরাপদ মাংস উৎপাদনের অঙ্গীকার করেছেন। কারণ তারা সরকারি উদ্যোগে এন্টিবায়োটিক-মুক্ত নিরাপদ মাংস উৎপাদনের প্রচেষ্টা নিয়ে শুধু সফলই হননি, বরং আগের চেয়ে বেশি মাংস উৎপাদন করতে পারছেন। শুধু তাই নয়, তারা খামারে পরিমিত ওষুধ ব্যবহার করায় আর্থিকভাবেও লাভবান হচ্ছেন। এ ব্যাপারে খামারিদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন প্রাণিসম্পদ সেবা পরিদপ্তর (ডিএলএস – ডিরেক্টরেট অব লাইভস্টক সার্ভিসেস) এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস। এতকাল খামারিরা নিজেদের অজান্তে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির প্ররোচনায় অপ্রয়োজনীয়ভাবে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার কওে স্বাস্থ্যঝুঁকিসম্পন্ন মাংস উৎপাদন করেছেন এবং আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাই সরকার নিরাপদ ব্রয়লার মাংস উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় কিছু খামারিকে প্রশিক্ষণ দেয়। খামারিরা জানিয়েছেন, আগে তারা এক হাজার মুরগির জন্য ১৫-১৮ হাজার টাকার ওষুধ কিনতেন। কিন্তু এন্টিবায়োটিক-মুক্ত মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর এখন লাগে মাত্র ৪-৫ হাজার টাকা, ফলনও হয় বেশি।

গাজীপুর জেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ভোরের কাগজকে জানিয়েছেন, তারা বিভিন্ন উপজেলায় পর্যায়ক্রমে এন্টিবায়োটিক ওষুধমুক্ত ব্রয়লারের মাংস উৎপাদনে এই প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখবেন ।

সরকার, প্রাণিসম্পদ সেবা পরিদপ্তর, গাজীপুর জেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসকে ধন্যবাদ জানাই একটি বড় সংকটের আংশিক সমাধানে এই পথপ্রদর্শক উদাহরণ রাখার জন্য । উপরোল্লিখিত অন্যান্য বিষয়গুলোতেও আমরা সরকারের এ ধরনের পজিটিভ ভূমিকা প্রত্যাশা করি । গত কয়েক বছরে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক মহল থেকে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে । এই বৈশ্বিক সমস্যা নিরসনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আমরা আবারও জাতিসঙ্ঘের প্রশংসা পেতে চাই ।❑